বিবর্তনের পথ ধরে

বন্যা আহমেদ

প্র থ ম অ ধ্যা য়
এলাম আমরা কোথা থেকে?

ইন্দোনেশিয়ার ছোট্ট একটি দ্বীপ ফ্লোরস (Flores)। এখানকার অধিবাসীরা পৃথিবীর অন্যান্য সব মানুষের মতোই কাজ করে, খায় দায়, ফুর্তি করে আর অবসর সময়ে গল্পগুজব করে। এখানকার বুড়োবুড়িরা আমাদের দাদী-নানীদের মতোই 'ঠাকুরমার ঝুলি' সাজিয়ে বসে নাতি-নাতনীদের কাছে হাজার বছরের মুখে মুখে চলে আসা উপকথাগুলোকে বলে যায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। কিন্তু এদের ঠাকুরমার ঝুলিগুলো যেন কেমনতর অদ্ভুত! লালকমল-নীলকমল আর দেও-দৈত্য নেই ওতে, আছে কতকগুলো ক্ষুদে বামনদের গল্প! মাত্র এক মিটারের মতো (৩ ফুটের সামান্য বেশি) লম্বা বেটে লিলিপুটের মতো এক ধরনের মানুষ অনেক অনেক দিন আগে তাদেরই আশপাশে নাকি বাস করত। এরা যা সামনে পেত তাই মুখে দিত। তাদের ফসল নষ্ট করত, নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলতো আর যা শুনতো তাই নাকি নকল করার চেষ্টা করত। 'এমনি একজন ক্ষুদে বামনের নাম ছিল এবু গোগো (এবু মানে নানী, আর গোগো মানে এমন কেউ যে যা সামনে পায় তাই খায়), তাকে খেতে দিলে সে খাওয়ার বাসনটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো, সুযোগ পেলে নাকি মানুষের মাংসও খেতে দ্বিধা করত না (১)। দ্বীপবাসীদের বলা গল্পগুলো শুনলে মনে হয় যেন এই সেদিনই তারা সবাই একসাথে বসবাস করত। নিছক রূপকথা ভেবেই বেঁটে-বাটুলদের গল্পগুলো সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল এতদিন। অবাক এক কাণ্ড ঘটল ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। বিজ্ঞানীরা ফ্লোরস দ্বীপেরই মাটি খুঁড়ে পেলেন ১ মিটার লম্বা একটা মানুষের ফসিল-কঙ্কাল, প্রথমে সবাই ভেবেছিল হয়তো কোনও বাচ্চার ফসিল হবে বুঝি এটা। কিন্তু তারপর ঠিক ওটারই কাছাকাছি জায়গাই পাওয়া গেল আরও ৬টি একই রকমের অর্ধ-ফসিলের কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষা করে বুঝলেন এগুলো আসলে পূর্ণাঙ্গ মানুষেরই কঙ্কাল, কার্বন ডেটিং থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী জানা গেল, মানুষের এই নব্য আবিষ্কৃত প্রজাতিটি (প্রজাতি হল এমন এক শ্রেণীর জীব যারা শুধু নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, যেমন আমরা অর্থাৎ আধুনিক মানুষ বা Homo Sapiens এখন পর্যন্ত পাওয়া মানুষের সবগুলো প্রজাতির মধ্যে একটাই প্রজাতি যারা এখনও টিকে আছে ঃ প্রজাতির উৎপত্তি এবং বিকাশ নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলছে তা পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল) মাত্র বার থেকে চৌদ্দ হাজার বছর আগে এই দ্বীপটিতে এসব ক্ষুদে মানুষরা বসবাস করত। ১২ হাজার বছর আগে এই দ্বীপে এক ভয়াবহ অগ্নুৎপাত ঘটেছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন হয়তো দ্বীপের অন্যান্য অনেক প্রাণীর সাথে এরাও সে সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, তারা আমাদের

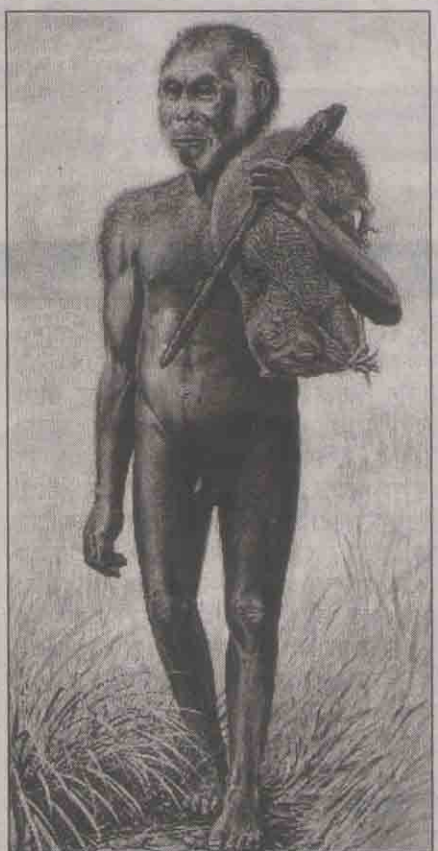

বামন মানুষের সম্ভাব্য প্রতিকৃতি
(National Geographic থেকে নেয়া)

হোমিনিড (মানুষ এবং বন মানুষ বা ape man কে Hominid গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়) গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের চোয়াল এবং মস্তিষ্কের মাপ আমাদের মতো আধুনিক মানুষের মতো নয়। উচ্চতায় মাত্র ১ মিটার কিন্তু হাতগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে বেশ লম্বাটে যা থেকে মনে হয় তারা তখনও অনেকটা সময় হয়তো গাছে গাছেই কাটাত। তাদের মাথার মাপ আবার খুবই ছোট–মাত্র ৩৮০ সিসি (কিউবিক সেন্টিমিটার), যেখানে আমাদের বা আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের মাপ হচ্ছে গড়ে ১৩৩০ সিসি। এত ছোট মগজ নিয়ে আধুনিক মানুষের মতো অস্ত্র বানিয়ে শিকার করে খাবার সংগ্রহের মতো বুদ্ধি কি ছিল তাদের, নাকি গাছের ডালে ঝুলে ঝুলেই তারা সময় কাটাত বানর বা শিম্পাজিদের মতো? এই প্রশ্নেরও উত্তর মিলল যখন তাদের ফসিলের পাশে সমসাময়িক কালের পুরনো বেশকিছু পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেল যা কিনা শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেই বানানো সম্ভব। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন সম্ভবত অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষের আরেকটি প্রজাতি হোমো ইরেক্টাসের (Home erectus) একটি দল এই দ্বীপে এসে বসবাস করতে শুরু করে। হাজার হাজার বছর ধরে অত্যন্ত ছোট এই দ্বীপটিতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করার ফলে তারা বিবর্তিত হতে হতে একসময় ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের ফসিলের আশপাশে একধরনের বামন হাতি এবং কমডো ড্রাগনসহ অন্যান্য বেশকিছু প্রাণীর ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

এই নব্য আবিষ্কৃত ক্ষুদে বামনগুলো (Hobbit) বিজ্ঞানীদেরকে বেশ অবাক করেছে। এদের কারণে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে তারা আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। এই যে এতদিন ধরে আমরা ভেবে এসেছি যে সাম্প্রতিককালে আমরা ছাড়া মানুষের আর কোনও প্রজাতি পৃথিবীতে ছিল না–সেটা তো আর তাহলে সত্যি নয়। ইউরোপের নিয়ান্ডারথালদেরও (Neanderthal) নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে তারাও আসলে আমাদের হোমো স্যাপিয়েন্স (homo sapiens) প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রায় ১৫০ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত তারা একটি ভিন্ন প্রজাতি রূপে বিচরণ করেছে পৃথিবীর বুকে। হয়তো আমরাই ইউরোপ দখল করে নেয়ার সময় তাদেরকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য করেছি। সে তো হলো ৩০-৪০ হাজার বছর আগের কথা, তারপর তো আর কারও সাথে আমাদেরকে এই পৃথিবী ভাগ করে নিতে হয়নি! কিন্তু এই বামন মানুষদের এত সাম্প্রতিককালে টিকে থাকার প্রমাণ মেলার পর বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন তাহলে হয়তো আরও কাছাকাছি সময়েও মানুষের একাধিক প্রজাতি টিকে ছিল। (২)।

শুধু যে বানর, বিড়াল, কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষেরও আরও প্রজাতি ছিল তাই তো নয়, জীববিজ্ঞান, অণুজীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বিজ্ঞানীরা আজকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে এক ধরনের বন মানুষ বা এপ (Ape) থেকে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে, এদের সাথে আমাদের ডিএনএর প্রায় ৯৮.৬% মিল রয়েছে। এ তো গেল আমাদের নিজেদের কথা, এদিকে আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল ১৩-১৫শ' কোটি বছর আগে, আর আমাদের সৌরজগতের উৎপত্তি ঘটে সাড়ে চারশ' কোটি বছর আগে। তারপর পৃথিবীর আরও ১০০ কোটি বছর লেগেছে তখনকার মহাপ্রলয়ঙ্করী উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে। এখন পর্যন্ত পাওয়া সব বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী বলা

৮ম বর্ষ, 22 সংখ্যা, ৭ই এপ্রিল, 2006

যায় পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি বা শুরু প্রায় সাড়ে ৩শ' কোটি বছর আগে। আমরা আজকে আমাদের চারপাশে প্রাণ বলতে যা বুঝি বা দেখি তার সাথে সেই আদিমতম প্রাণের কিন্তু কোনও মিলই ছিল না–প্রাণ বলতে ছিল শুধু একধরনের রাসায়নিক স্যুপের মতো দেখতে আণুবীক্ষণিক আদিম জীবন্ত কোষের সমাহার। গঠনের দিক থেকে এরা আজকের দিনের ব্যাকটেরিয়ার থেকেও অনেক বেশি সাধারণ এবং সরল। দেখতে যেমনই বা যত আণুবীক্ষণিকই হোক না কেন এদেরকে জীবন্ত বলে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া কোনও উপায়ও নেই! এরা তো জীবের মৌলিক দুটো বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে যা কোনও জড় পদার্থের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়–এরা একদিকে যেমন বাইরের পরিবেশ থেকে সক্রিয়ভাবে শক্তি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, বড় হয় এবং বদলায়, তেমনিভাবে আবার নিজেদের বংশ বৃদ্ধিও করতে পারে। আর সাড়ে তিনশ' কোটি বছর আগে এই আদিম এবং সরলতম জীবগুলো থেকেই শুরু প্রাণের বিকাশ এবং বিবর্তনের অগ্রযাত্রা। কোটি কোটি বছর ধরে ঘটে আসা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সরলতম এক কোষী প্রাণীগুলো থেকেই উদ্ভব ঘটেছে আমাদের চারপাশের মানুষ সহ অন্যান্য সব জীবের।

বিবর্তনের এই দীর্ঘ ইতিহাসের বইয়ের কোনও পাতায় এবং মাহেন্দ্রক্ষণে তাহলে মানুষের দেখা মিলল? একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় এসে আমরা পাই মানুষ নামের আমাদের এই আধুনিক প্রজাতিটির সাক্ষাৎ এবং তার পূর্বপুরুষদের সন্ধান। ৪০-৮০ লাখ বছর আগে এক ধরনের বানর প্রজাতি দুই পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তার থেকে আমাদের অর্থাৎ আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র এক লাখ বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক সময়ের স্কেলে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা একেবারে আনকোরা। ধরা যাক, পৃথিবীর বয়স একদিন বা ২৪ ঘণ্টা, তার মানে মানুষ নামের এই তথাকথিত সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিটির জন্ম হয়েছে ২৪ ঘণ্টা ফুরানোর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে!

তাহলে এখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, এই যে ছোটবেলা থেকে আমাদের মুরুব্বীরা, প্রচারযন্ত্রগুলো, মসজিদ-গীর্জা-মন্দিরের হুজুর-পাদ্রী-পুরোহিতরা মানুষের সৃষ্টি নিয়ে যেসব আজগুবি গল্প গিলিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করল তার সাথে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত আমাদের সৃষ্টি এবং বিবর্তনের তত্ত্বের কোনও মিল নেই কেন? কারণ, ক'দিন আগেও মহাবিশ্ব বা প্রাণ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা বোঝার জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা উপায়গুলোর প্রয়োজন তা মানুষের জানা ছিল না। তখনও মানুষ অর্জন করেনি কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। কিন্তু নিজের সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কৌতূহলের তো কোনও অন্ত ছিল না মানুষের সেই সময়ের আদি থেকেই। তাই এই সৃষ্টি রহস্য নিয়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই প্রাচীন কাল

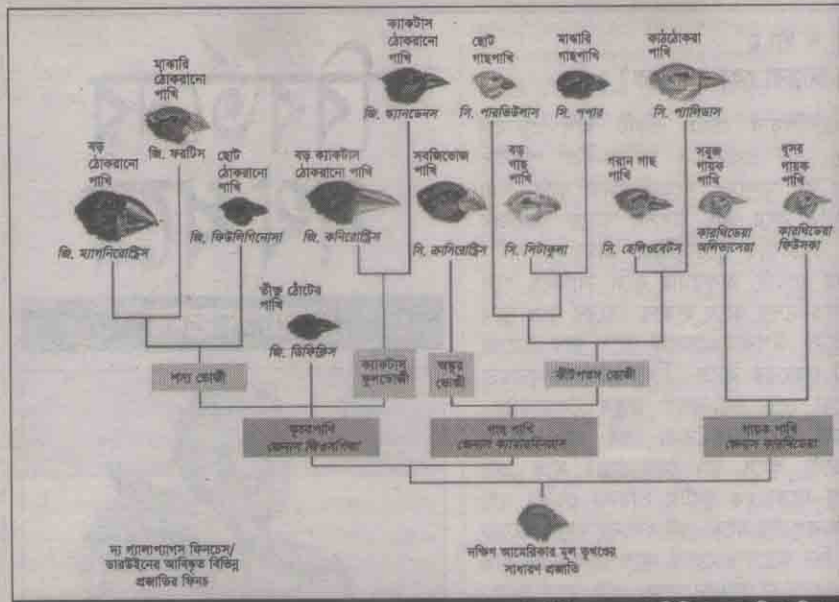

ডারউইনের দেখা বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ
(http://www.rit.edu/~rhrsbi/Galapages/DaewinFinch.html থেকে

থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে নানা ধরনের কল্পকাহিনী, ইংরেজিতে যাকে বলে মিথ (Myth)। প্রাচীন সভ্যতার ধারক মানুষগুলো বিভিন্ন কালে সে সময়ের ধর্মগ্রন্থাদিসহ তদানীন্তন স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী একেক ধরনের গল্প ফেঁদেছে। হিন্দু পুরাণ বলছে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল তখন বিরাট মহাপুরুষ পরম ব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন, সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ওই বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ওই বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করেন। তারপর ওটিকে বিভক্ত করে আকাশ ও ভূমণ্ডল আর পরবর্তীসময়ে প্রাণ সৃষ্টি করেন। বাইবেল এবং কোরআন বলছে, সৃষ্টিকর্তা ছয়দিনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে বাইবেলের (জেনেসিস) ধারণা অনুযায়ী ছয়দিনের প্রথম দিনটিতেই ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন। এর তিনদিন পর তিনি সূর্য, চন্দ্র আর তারকারাজির সৃষ্টি করেন– আর এসব কিছুই তিনি তৈরি করেছিলেন মাত্র ৬ হাজার বছর আগে। আবার প্রাচীন চৈনিক একটি কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুরুতে একটা কালো ডিমের মতো ছিল। প্যান গু নামের একজন দেবতা তার কুড়ালের কোপে ডিমটিকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং মহাবিশ্বকে প্রসারিত হবার সুযোগ করে দেন। প্যান গুর শরীরের মাছি আর উঁকুন থেকেই নাকি পরবর্তীকালে মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছে। আবার অ্যাপাচি কল্প-কাহিনী অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরুতে আসলে কিছুই ছিল না–না ছিল এই পৃথিবী, আকাশ কিংবা কোনও সূর্য-চন্দ্র-তারা। এই তমসাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকার থেকে হঠাৎ করেই একটি পাতলা চাকতির অভ্যুদয় ঘটে, যেখানে আসীন ছিলেন এক 'দাঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক' এ জগতের মালিক, আমাদের বিশ্বপিতা! নিজের ইচ্ছায় জগৎ থেকে শুরু করে প্রাণ সব কিছুই সৃষ্টি করেন...মানুষের সৃষ্টি এমনতর হাজারও গল্পের সন্ধান পাওয়া বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় এবং ধর্মগ্রন্থে।

আসলে শতকের শেষভাগ থেকেই মানুষ শুরু করে এই কল্পকাহিনীগুলো নিয়ে পড়ে চলবে না, কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে পাওয়া প্রমাণগুলো ইতোমধ্যেই চোখে আঙুল দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে যে, মহাবিশ্বের সবকিছুর মতোই আমাদের এই পৃ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হতে হতে অ আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এই কোটি বছরের ইতিহাস হচ্ছে ছোট, বড় ক্রমাগত থেকে শুরু করে অত্যন্ত নাটকীয় অকস্মাৎভাবে ঘটা পরিবর্তন, বিকাশ বিবর্তনের ইতিহাস, যা আসলে আ আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে অন পৃথিবীর মাটির বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা প্রাণী এবং উদ্ভিদের ফসিল থেকে আমরা পরিবর্তনের নিদর্শন দেখতে পাই। ডিএনএ (DNA) বিশ্লেষণ করেও পাওয়া একই তথ্য। মানুষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, থাকার ইতিহাস বুঝতে হলে এই দীর্ঘ পরি ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে হবে; কুসংস্কার, প্রাচীন এবং অবৈজ্ঞানিক ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পৃ বিশ্লেষণ করতে শিখতে হবে।

বিবর্তন নিয়ে (Evolution) এত মাথা ব্যথা

মনে অবশ্য প্রশ্ন জাগতে পারে, কে আমাদের বিবর্তন সম্পর্কে জানতে হ খুঁটিনাটি বুঝতে হবে? দিব্যি তো দিন চলে এসব তত্ত্বকথা না জেনেই। একটু খেয়া

আশপাশে তাকালেই দেখা যাবে যে, বিবর্তনের তত্ত্ব ছাড়া আজকে আমাদের চারপাশের অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, অনেক সহজ প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। যেমন ধরুন, ডাক্তাররা কেন বারবার করে রোগীকে তার অ্যান্টিবায়োটিকের পুড়ো ডোজটা শেষ করতে বলে দেন? আমাদের সাথে ওই বেচারী ইঁদুরগুলোর কিইবা মিল রয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা মানুষের উপর নতুন কোনও ওষুধ প্রয়োগ করার আগে তাদের উপর পরীক্ষা করে নেন? কিংবা আমাদের চারপাশে এত্ত ধরনের প্রাণের সমাহার কেন, তাদের দরকারটাই বা কি ছিল? পৃথিবীর একেক জায়গায় কেন একেক রকমের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়? আমরাই বা এলাম কোথা থেকে? কেন একেক জায়গার মানুষ দেখতে একেক রকম হলো?...

বিবর্তনবাদের মাধ্যমে আজকে আমরা আমাদের চারপাশের জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। আমাদের চারপাশের জীবের মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন, এমনকি একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের কেন এত পার্থক্য? এর ফলশ্রুতিতেই তারা একেকজন একেক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে খাবার এবং শক্তি জোগাড় করে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। যেমন–মানুষের কথাই ধরা যাক, সব মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যের কোনও শেষ নেই। একেক এলাকার মানুষের মধ্যে একেক রকমের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে পার্থক্যটা চোখে পড়ে তা হচ্ছে মানুষের গায়ের রঙ। কালো রঙ এর গায়ের মানুষের সূর্যের তাপ থেকে নিজের চামড়াকে রক্ষা করার ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। তাই আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই যে, শীতের দেশের মানুষের চামড়া অনেক বেশি সাদা আর গরমের দেশের মানুষের গায়ের রঙ কালো হয়। অবশ্য ইতিহাসের পরিক্রমায় মানুষ তার জীবন আর জীবিকার তাগিদে এতবার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে যে, এখন সব জায়গায় এই পার্থক্য আর এত সূক্ষ্মভাবে নাও দেখা যেতে পারে। ডারউইন যে বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে বা ফিঞ্চ পাখি (Finch) দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন তাদের কথাই ধরি। গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে তিনি বিভিন্ন রকমের ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ দেখতে পান, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের ঠোঁটের আকারও বদলে গেছে। অতীতে এক সময় সব রকমের ফিঞ্চই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, সময়ের সাথে সাথে বিবর্তনের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এরকম ১৪ ধরনের প্রজাতির ফিঞ্চপাখী খুঁজে পেয়েছেন।

আবার ঠিক উল্টোভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য এবং জীনের গঠনের মধ্যে অকল্পনীয় রকমের মিল দেখা যাচ্ছে (৪)। যেমন ধরুন, মানুষের হাতের হাড় এবং একটি বিশাল

ডারউইনের অরিজিন অব স্পেসিস
(http://evolution.berkely.edu/evosite/misconceps/Aorigintheory.stml থেকে নেয়া)

একেবারে অন্য জাতির জীব– তিমি মাছের সামনের পাখার হাড় প্রায় একইরকম। আবার, জন্মপূর্ববর্তী ভ্রূণাবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীর বাচ্চাদের আকৃতি অনেকটা একইরকম দেখায়। শিম্পাঞ্জীদের সাথে আমাদের ডিএনএ প্রায় ৯৮.৬%, ওরাং ওটাং এর সাথে ৯৭% (৫), আর ইঁদুরের সাথে ৮৫% (৬) মিল রয়েছে। এসব সাদৃশ্যের পেছনে কারণ একটাই, পৃথিবীর সব প্রাণীই একই আদি জীব বা পূর্বপুরুষ থেকে কোটি কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। যে জীব যত পরে আরেক জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতি বা জীবে পরিণত হয়েছে তার সাথে ওই জীবের তত বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বিবর্তনের প্রক্রিয়া থেকে আমরা চারপাশের পরিবেশ, প্রকৃতি এবং তার গঠন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণাও পাই। বিবর্তনের মাধ্যমে যেমন অহরহ জীবের পরিবর্তন ঘটছে আবার তারই ফলশ্রুতিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে আমাদের পারিপার্শ্বিকতারও। এর একটা মজার উদাহরণ হচ্ছে পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেনের আবির্ভাব। আমাদের তো উদ্ভবই ঘটতো না বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে! ভাবতে অবাক লাগে যে আদি পৃথিবীর বাতাসে মুক্ত অক্সিজেনের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। প্রায় আড়াইশ' কোটি বছর আগে সালোক সংশ্লেষণকারী বা ফটো সিনথেটিক উদ্ভিদের বিবর্তন ঘটে যারা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করতে শুরু করে এবং বিনিময়ে পরিবেশে মুক্ত অক্সিজেন ছেড়ে দিতে শুরু করে। তার ফলেই আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। এই যে আমরা আমাদের চারপাশে মানুষসহ অক্সিজেন গ্রহণকারী সব প্রাণী দেখছি, তাদের সবারই বিবর্তন ঘটেছে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছড়িয়ে পড়ার পর।

জীবের বিবর্তন না বুঝলে আজকে চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলো কীভাবে ওষুধ প্রয়োগের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে আরও শক্তিশালী এবং পরিবর্তিত রূপ ধারণ করতে পারে তা না বুঝলে আজকে ওষুধ কোম্পানিগুলোর ঠিক অসুখের জন্য ঠিক ওষুধটা তৈরি করাই বন্ধ করে দিতে হবে। আজকে ডাক্তাররা অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন, কারণ আমাদের শরীরে রোগ সারাতে যত বেশি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হচ্ছে ততই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাতে খাপ খাইয়ে নিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। একই ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করার সময়েও। ক'দিন আগে আমেরিকার একটি স্টেটের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ইদানীংকালে সেখানকার হাসপাতালগুলো থেকেই অনেক বেশি রোগী জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে অর্থাৎ তারা আসে এক রোগের চিকিৎসা করাতে আর ঘরে ফিরে যায় হাসপাতাল থেকে পাওয়া অন্য রোগের জীবাণু শরীরে নিয়ে। এর থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার রোগী মারাও যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকে অভ্যস্ত হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে আর তার ফলে হাসপাতালগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য শক্তিশালী জীবাণু যাদেরকে নিরোধ করতে ডাক্তাররা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন।

বিবর্তনের ধারণা জানার এবং বোঝার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। বিবর্তনবাদ আমাদের সময়ের এমনই একটি শক্তিশালী তত্ত্ব যে এর বিস্তৃতি শুধু বৈজ্ঞানিক বা টেকনিক্যাল জগতেই নয় বরং সামাজিকভাবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অংশ, এর কথা শুনলেই আঁতকে ওঠেন, কারণ এটা আমাদের প্রচলিত পুরনো, অবৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় ধারণাগুলোকে সমর্থন করে না। বিবর্তনবাদকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখার মাধ্যমে আমরা নিজেরা যেমন আমাদের চারদিকের প্রকৃতি এবং পরিবেশকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শিখব, তেমনিভাবে বুঝতে এবং অন্যদেরকে বুঝাতে পারব বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা বহু স্থবির চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। বিবর্তনবাদ বলে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তনই জগতের মূল নিয়ম, নতুনকে, পরিবর্তনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোই প্রকৃতির রীতি। সব কিছুই ঘটছে আমাদের চোখেরই সামনে কখনও খুবই ধীরে, কখনও বা আকস্মিকভাবে খুব দ্রুতগতিতে। পরিবর্তন ঘটছেই। বাইরের কোনও ঐশ্বরিক শক্তি এসে যেমন আমাদের কোনও কিছু বদলে দিয়ে যাচ্ছে না, তেমনি পরলৌকিক পুরস্কারের জন্যও হা-পিত্যেশ করে বসে থাকার কোনও কারণ নেই। নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামের মাধ্যমেই পরিবর্তিত হতে হতে আমরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছি।

তাই বিজ্ঞানের ইতিহাসে গুটিকয়েক যে বড় বড় ঘটনা ঘটেছে তার একটি বলে এই বিবর্তনবাদ

ধরে নেয়া হয়। পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গার যেমন বলেছেন,

'....তবে গত পাঁচ শতাব্দীতে অন্ততপক্ষে দু'টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বড় paradigm shift হিসেবে চিহ্নিত করা যায় : (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের আবিষ্কৃত সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব–পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং (২) উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস-এর প্রস্তাবিত প্রকল্প–প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন। এই দু'টি আবিষ্কার শুধু যে মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল তাই নয়, এ দু'টি আবিষ্কার তখনকার প্রাচীন এবং গভীরভাবে সুরক্ষিত চিন্তা পদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে পুরনো ধারণাগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তত্ত্ব দু'টি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রাচীন চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আঘাত করেছিল–যেগুলোকে মানুষ এতদিন ধরে সৃষ্টিকর্তার অভ্রান্ত বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতো (৭)।'

অনেকে মনে করেন, বিবর্তন তত্ত্ব বোধ হয় প্রাণের উৎস নিয়ে কাজ করে। এটি কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। উৎস নিয়ে আসলে বিবর্তন তত্ত্বের কোনও মাথা ব্যথা নেই, এটি কাজ করে মূলত প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে। যদিও বিজ্ঞান জীবনের উৎস সন্ধানে খুবই তৎপর (যেমন প্রাণের জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব, প্যানস্পার্মিয়া ইত্যাদি তত্ত্ব দ্রষ্টব্য), কিন্তু এগুলোর কোনওটিই বিবর্তন তত্ত্বের মূল বিষয় নয়। যেভাবেই জীবনের উৎপত্তি ঘটুক না কেন, সেটি কি করে পদে পদে বিকশিত হলো, বিবর্ধিত হলো, উদ্ভব ঘটল নতুন নতুন প্রজাতির–এগুলোই বিবর্তন তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়।

ডারউইনের প্রস্তাবিত এই বিবর্তনবাদে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে, সাম্প্রতিককালের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিনস সুন্দরভাবে অল্প কথায় বর্ণনা করেছেন জীববিজ্ঞানের এই মূল দু'টি তত্ত্বকে,

জীববিজ্ঞানে ডারউইনের মূল অবদান একটি নয় দুটি, আর এই দুটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছাড়া বিবর্তনবাদ বোঝা সম্ভব নয়। তিনিই প্রথম পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখান যে, জীবজগৎ স্থিতিশীল নয়–বিবর্তন ঘটছে, কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন ঘটছে। আর তারপর ওয়ালেসের সাথে একসাথে প্রথমবারের মতো ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Natural Selection প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ঘটে চলেছে এই নিরন্তর পরিবর্তন, যা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জীববিজ্ঞানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলতত্ত্ব (৮)। (চলবে)

তথ্যসূত্র :

1.http:/www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/10/28whuman228.xml&sSheet=/news/2004/10/28/ixnewstop.html

2.http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3960001.stm
http://www.nature.com/news/specials/fossils/index.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3948165.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3964579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3431609.stm

3.www.http://rwor.org/s/evolution_e.htm

4.http// www.nap.edu/readingroom/books/evolution98/evol1.html

5.Stringer, Chris and Andrews. Peter (2005), The Complete World of Human Evolution. Thames and Hudson. New York, USA.,

6. San fransisco Chomicle : Dec 5 2001, Medical Writer, 'OF MICE AND MEN Striking similarities at the DNA level could aid research':
http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/c/a2002/12/05/MN153329.DTL&type=science.

7.Stenger, Victor J, Has Science Found God? Prometheus Books, New York, USA

8. http://www.bbc.co.uk/education/darwin/leghist/dawkins.htm